হিংয়ের কচুরি

আমাদের বাসা ছিল হরিবাবুর খোলার বাড়ির একটা ঘরে। অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে বাড়িটাতে বাস করতো। এক ঘরে একজন চুড়িওয়ালা ও তার স্ত্রী বাস করতো। চুড়িওয়ালার নাম ছিল কেশব। আমি তাকে 'কেশবকাকা' বলে ডাকতাম।

সকালে যখন কলে জল আসতো, তখন সবাই মিলে ঘড়া, কলসি, টিন, বালতি নিয়ে গিয়ে হাজির হোত কলতলায় এবং ভাড়াটেদের মধ্যে ঝগড়া বকুনি সুরু হোত জল ভর্ত্তির ব্যাপার নিয়ে।

বাবা বলতেন মাকে, এ বাসায় আর থাকা চলে না। ইতর লোকের মত কাণ্ড এদের। এখান থেকে উঠে যাবো শীগ্‌গির।

কিন্তু যাওয়া হোত না কেন, তা আমি বলতে পারবো না। এখন মনে হয় আমরা গরীব বলে, বাবার হাতে পয়সা ছিল না বলেই।

আমাদের বাসার সামনে পথের ওপারে একটা চালের আড়ত, তার পাশে একটা গুড়ের আড়ত, গুড়ের আড়তের সামনে রাস্তার ওপর একটা কল। কলে অনেক লোক একসঙ্গে ঝগড়া-চেঁচামেচি করে জল নেয়। মেয়েমানুষে মেয়েমানুষে মারামারি পর্য্যন্ত হতে দেখেছিলাম একদিন।

এই রকম করে কেটেছিল সে-বাসায় বছরখানেক, এক আষাঢ় থেকে আর এক আষাঢ় পর্য্যন্ত।

আষাঢ় মাসেই দেশের বাড়ি থেকে এসেছিলাম। দেশের বাড়িতে বাঁশবাগানের ধারে ধুত্‌রো ফুলের ঝোপের পাশেই আমি আর কালী দুজনে মিলে একটা কুঁড়ে করেছিলাম। কালীর গায়ে জোর বেশি আমার চেয়ে, সে সকাল থেকে কত বোঝা আশস্যাওড়ার ডাল আব পাতা যে ব'য়ে এনেছিল! কি চমৎকার কুঁড়ে করেছিলাম দুজনে মিলে, ঠিক যেমন সত্যিকার বাড়ি একখানা। কালী তাই বলতো। একটা ময়নাকাঁটা গাছের মোটা ডালে সে পাখীর বাসা বেঁধে দিয়েছিল, ও বলতো শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে কিংবা নষ্টচন্দ্রের রাতে রাত-চরা কাঠঠোকরা কিংবা তিওড় পাখি ওখানে ডিম পেড়ে যাবে।

এ সব সম্ভব হয়নি আমার দেখে আসা, কারণ আষাঢ় মাসেই গ্রাম থেকে চলে এসে কলকাতার এই খোলার বাড়িতে উঠেছি।

আমার কেবল মনে হয় দেশের সেই বাঁশবনের ধারের কুঁড়েখানার কথা, কালী আর আমি কত কষ্ট করে সেখানা তৈরি করেছিলাম, ময়না গাছের ডালে বাঁধা সেই পাখির বাসার কথা—নষ্টচন্দ্রের রাতে কাঠঠোকরা পাখি সেখানে ডিম পেড়েছিল কিনা কে জানে?

কলকাতার এ বাড়িতে জায়গা বড্ড কম, লোকের ভিড় বেশি। আমি সামনে টিনের বারান্দাতে সারা সকাল বসে বসে দেখি কলে পাড়ার লোক জল নিতে এসেচে, গুড়ের আড়তের সামনে গুড় নামাচ্চে গরুর গাড়ি থেকে, বাঁ কোণের একটা দোতলা বাড়ির জানলা থেকে একটি বৌ আমার মত তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। এই গলি থেকে বার হয়ে বড় রাস্তার মোড়ে একটা হিন্দুস্থানী দোকানদারের ছাতুর দোকান থেকে আমি মাঝে মাঝে ছাতু কিনে আনি। বড় রাস্তায়

অনেক গাড়ি ঘোড়া যায়, আমাদের গ্রামে কখনো একখানা ঘোড়ার গাড়ি দেখিনি, দুচোখ ভরে চেয়ে চেয়ে দেখেও সাধ মেটে না, কিন্তু মা যখন তখন বড় রাস্তায় যেতে দিতেন না, পাছে গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়ি।

আমাদের বাড়ি থেকে কিছুদূরে গলির ও-মোড়ে কতকগুলো সারবন্দি খোলার বাড়ি, আমাদেরই মত। সেখানে আমি মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই। তাদের বাড়ি-ঘর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কত কি জিনিসপত্র আছে, আয়না, পুতুল, কাঁচের বাক্স, দেওয়ালে কেমন সব ছবি টাঙানো। এক এক ঘরে এক একজন মেয়েমানুষ থাকে। আমি তাদের সকলের ঘরেই যাই, বিকেলের দিকে যাই, সকালেও মাঝে মাঝে যাই।

ওই বাড়িগুলোর মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার নাম কুসুম। সে আমাকে খুব ভালবাসে, আমিও তাকে খুব ভালবাসি। কুসুমের ঘরেই আমি বেশিক্ষণ সময় থাকি। কুসুম আমার সঙ্গে গল্প করে, আমাদের দেশের কথা জিগ্যেস করে, তাদের বাড়ি বর্দ্ধমান বলে কোন্ জায়গা আছে, সেখানে ছিল। এখন এই ঘরেই থাকে।

কুসুম বলে—তোমায় বড্ড ভালবাসি, তুমি রোজ আসবে তো?

—আমিও ভালবাসি। রোজ আসিই তো।

—তোমাদের দেশ কোথায়?

—আসসিংডি, যশোর জেলা।

—কলকাতায় আগে কখনো আসনি বুঝি?

—না।

বিকেলবেলা কুসুম চমৎকার সাজগোজ করতো, কপালে টিপ পরতো মুখে ময়দার মত কি গুঁড়ো মাখতো, চুল বাঁধতো—কি চমৎকার মানাতো

ওকে। কিন্তু এই সময় কুসুম আমাকে তার ঘরে থাকতে দিত না, বলতো—তুমি এবার বাড়ি যাও। এবার আমার বাবু আসবে।

প্রথমবার তাকে বলেছিলাম—বাবু কে ?

—সে আছে। সে তুমি বুঝবে না। এখন তুমি বাড়ি যাও।

আমার অভিমান হোত, বলতাম—আসুক বাবু। আমি থাকবো। কি করবে বাবু আমার ?

—না না তুমি চলে যাও। তোমাব এখন থাকতে নেই। অমন করে না লক্ষ্মীটি !

—বাবু তোমার কে হয় ? ভাই ?

—সে তুমি বুঝবে না। এখন যাও দিকি বাড়ি।

আমার বড় কৌতূহল হোত, কুসুমের বাবুকে দেখতেই হবে। কেন ও আমাকে বাড়ি যেতে বলে ?

একদিন তাকে দেখলাম। লম্বা চুল, বেশ মোটাসোটা লোকটা—হাতে একটা বড় ঠোঙায় এক ঠোঙা কি খাবার। কলকাতার দোকানে খাবার কিনতে গেলে ঐবকম পাতার ঠোঙায় খাবার দেয়। আমাদের দেশে ঐ পাতা নেই ; সেখানে হরি ময়রার দোকানে মুড়কি কি জিলিপি কিনলে পদ্মপাতায় জড়িয়ে দেয়।

কুসুম ঠোঙা খুলে আগে আমার হাতে একখানা বড় কচুরি দিয়ে বল্লে—এই নাও, খেতে খেতে বাড়ি যাও।

এক কামড় দিয়ে আমার ভারি ভাল লাগলো। এমন কচুরি কখনো খাইনি। আমাদেব গ্রামেব হরি ময়রা যে কচুরি করে, সে তেলে-ভাজা কচুরি এমন চমৎকার খেতে নয়।

উচ্ছ্বসিত স্বরে বল্লাম—বাঃ ! কিসের গন্ধ আবার।

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE LIBRARY Agartala.

কুসুম বল্লে—হিংয়ের কচুরি, হিংয়ের গন্ধ। ওকে বলে হিংয়ের কচুরি—এইবার বাড়ি যাও—

কুসুমের বাবু বল্লে—কে ?

—কলের সামনের বাড়ির ভাড়াটেদের ছেলে। বামুন।

কুসুমের বাবু আমার দিকে ফিরে বল্লে—যাও খোকা, এইবার বাড়ি যাও।

একবার ভাবলাম বলি, আমি থাকি না কেন, থাকলে দোষ কি ? কিন্তু কুসুমের বাবুর দিকে চেয়ে সে কথা বলতে আমার সাহসে কুলুলো না। লোকটা যেন রাগী মতো, হয়তো এক ঘা মেরেও বসতে পারে। কিন্তু সেই থেকে হিংয়ের কচুরির লোভে আমি রোজ বাঁধা নিয়মে কুসুমের বাবু আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি। আর রোজই কি সকলের আগে কুসুম আমার হাতে দুখানা কচুরি তুলে দিয়ে বলবে—যাও খোকা, এইবাব খেতে খেতে বাড়ি চলে যাও—

কুসুমের বাবু বলতো—আহা, ভুলে গেলাম। ওর জন্যে খাস্তা গজা দুখানা আনবো ভেবেছিলাম কাল। দাঁড়াও কাল ঠিক আনবো—

আমার ভয় কেটে গেল। বল্লাম—এনো ঠিক কাল ?

কুসুমের বাবু হি হি করে হেসে বল্লে—আনবো আনবো।

কুসুম বল্লে—এখন বাড়ি যাও খোকা—

—আমি এখন যাবো না। থাকি না কেন ?

কুসুমের বাবু আমার এই কথার উত্তরে কি একটা কথা বল্লে আমি তার মানে ভালো বুঝতে পারলাম না। কুসুম ওর দিকে চেয়ে রাগের সুরে বল্লে—যাও, ওকি কথা ছেলেমানুষের সঙ্গে ?

বাড়ি গিয়ে মাকে বল্লাম—মা তুমি হিংয়ের কচুরি খাও নি ?

—কেন ?

—আমি খেয়েছি। এত বড় বড়, হিংয়ের গন্ধ কেমন।

—কোথায় পেলি?

—কুসুমের বাবু এনেছিল, আমায় দিয়েছিল।

—পাজি ছেলে, ওখানে যেতে বারণ করেছি না? ওখানে যাবে না।

—কেন?

—কেন কথার উত্তর নেই। ওখানে যেতে নেই। ওরা ভাল লোক না।

—না মা, কুসুম বেশ লোক। আমাকে বড্ড ভালবাসে। হিংয়ের কচুরি বোজ দেয়।

—আবার বলে হিংয়ের কচুরি? বাড়িতে খেতে পাও না কিছু? খবরদার ওখানে যাবে না বলে দিচ্ছি।

কুসুমের বাড়ি এর পরে আর দিন-দুই আদৌ গেলাম না। কিন্তু থাকতে পারিনে না গিয়ে। আবার মাকে লুকিয়ে গেলাম একদিন। কুসুম বল্লে—তুমি আসনি যে?

—মা বারণ করে।

—তবে তুমি এসো না। মা আবার বকবে।

—আসিনি তো দুদিন।

—এলে যে আবার?

—তোমায় ভালবাসি তাই এলাম।

—ওরে আমার সোনা। তুমি না এলে আমারও ভাল লাগে না। তুমি না এলে তোমার জন্যে মন কেমন করে।

—আমারও।

—কি করবো, তেমন কপাল করিনি। তোমার মা তোমায় পাছে বকেন তাই ভাবচি।

—মাকে বলবো না। আমার মন কেমন করে না এলে। আমি এখন যাই।

—সন্ধের সময় এসো।

—ঠিক আসবো।

কুসুমের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সন্ধের সময় যাই। কুসুমের বাবু এসে আমায় দেখে বল্লে—এই যে ছোকরা। ক'দিন কেন দেখিনি? সেদিন তোমার জন্যে খাস্তা গজা নিয়ে এলাম, তা তোমার অদৃষ্টে নেই। দাও গো ওকে দুখানা কচুরি।

—গজা এনো কাল।

—আনবো গো বামুন ঠাকুর, ফলারে বামুন! কাল অমৃতি জিলিপি আনবো। খেয়েচ অমৃতি?

—না।

—কাল আনবো, এসো অবিশ্যি।

—কাউকে বোলো না কিন্তু। মা শুনলে আসতে দেবে না।

—তোমার মা বকেন বুঝি এখানে এলে?

—হুঁ।

কুসুম তাড়াতাড়ি বল্লে—আরে ওর কথা বাদ দাও। ছেলেমানুষ পাগল, ওর কথার মানে আছে! তুমি বাড়ি যাও আজ খোকা। এই নাও কচুরি। খেতে খেতে যাও—

—না, এখানে খেয়ে জল খেয়ে যাই, মা টের পাবে।

—এখানে তোমাকে জল দেবো না। রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে যেও।

কুসুমের বাবু বল্লে—কেন ওকে জল দেবে না কেন? কি হবে দিলে?

কুসুম ঝাঁজের সুরে বল্লে—তুমি থামো। বামুনের ছেলেকে হাতে

করে জল দিতে পারবো নি। এই জন্মের এই শাস্তি। খাবার দিই হাতে করে তাই যথেষ্ট।

আমার মনে মনে বড় অভিমান হোল কুসুমের ওপর। কেন আমি এতই কি খারাপ যে আমায় হাতে করে জল দেওয়া যায় না? চলে আসবার সময় কুসুম বার বার বল্লে—কাল সকালে কিন্তু ঠিক এসো। কেমন?

আমি কথা বল্লাম না।

পরদিন সকালে গিয়ে দেখি কুসুম বসে সজ্‌নের ডাঁটা কুটচে। আমায় বল্লে—এসো খোকা—

—তোমার সঙ্গে আড়ি।

—ওমা সে কি কথা? কি করলাম আমি?

—তুমি বল্লে জল দেওয়া যায় না আমাকে। জল খেতে দিলে না কাল।

—এই! বসো বসো খোকা। সে তুমি বুঝবে না। তুমি বামুন, তোমাকে জল আমরা দিতে পারিনে। বুঝলে? কুলের আচার করচি, খাবে? এখনো হয়নি। সবে কুল গুড় দিয়ে মেখেচি—

এইভাবে কুসুমের সঙ্গে আবার ভাব হয়ে গেল। কুলের আচার হাতে পড়তেই আমি রাগ অভিমান সব ভুলে গেলাম। দুজনে অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। তারপর আমি উঠে মাখমের ঘরে যাই। মাখম কুসুমের পাশের ঘরে থাকে। ওর ঘরটি যে কত রকমের পুতুল দিয়ে সাজানো! একটা কাঠের তাকে মাটির আতা, আম, লিচু কতরকমের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস। অবিকল আতা। অবিকল আম।

মাখম বল্লে—এসো খোকা। ও সব মাটির জিনিসে হাত দিও না। বোসো এখানে এসে। ভেঙে যাবে।

—আচ্ছা, তুমি তামাক খাও কেন?

মাখম হাসিমুখে বল্লে—শোনো কথা। তামাক খায় না লোক?

—মেয়েমানুষে খায় বুঝি? কই আমার মা তো খায় না। বাবাখায়।

—শোনো কথা। যে খায় সে খায়।

—কুসুমের বাবু আমায় খাস্তা গজা দেবে।

—বটে! বেশ বেশ।

—তোমার বাবু কোথায়?

মাখম মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

—হিহি—শোনো কথা ছেলের—কি যে বলে!—হি হি—ও কুস্‌মি, শুনে যা কি বলে তোর ছেলে—

মাখমের বয়েস কুসুমের চেয়ে বেশি বলে আমার মনে হোত। কুসুম সব চেয়ে দেখতে সুন্দর। মাখমকে দিদি বলে ডাকতো কুসুম।

কুসুম এসে হাত ধরে আমাকে ওব ঘবে নিয়ে গেল। কুসুম আমায় বারণ করেছিল আর কারো ঘবে যেতে। আমি প্রকৃতপক্ষে যেতাম খাবার লোভে। কিন্তু অন্য মেযেদেব ঘরের বাবু কখন আসতো কি জানি। সুতরাং সে বিষয়ে আমায় হতাশ হতে হয়ে ছিল। কুসুম আমায় ঘরে নিয়ে গিয়ে বকলে। বল্লে—অত শত কথা তোমার দরকার কি শুনি, তুমি ছেলেমানুষ? কোনো ঘরে যেতে পারবে না, বোসো এখানে।

—আমি প্রভার কাছে যাবো—

—কেন, সেখানে কেন? যা তা বলবে সেখানে গিয়ে আবার। বোকা ছেলে। খাওয়ার লোভ, না? এই তো দিলাম কুলচুর।

আমি আশ্চর্য্য হওয়ার সুরে বল্লাম—আমি চেয়ে খাইনি। প্রভাকে জিগ্যেস কোরো।

—বেশ, দরকার নেই প্রভার কাছে গিয়ে।

—একটিবার যাবো? যাবো আর আসবো।

সত্যি বলচি প্রভাব ঘরে যাওয়ার কারণ ততটা লোভ নয়, যতটা একটা টিয়া পাখী।

টিয়া পাখীটা বলে—রাম, রাম, কে এলে? দূর ব্যাটা, কাকীমা, কাকীমা। আমি ঢুকে দাঁড়ালেই বলে—কে এলে? কে এলে?

—আমাব নাম বাসুদেব।

—কে এলে? কে এলে?

আমি হেসে উঠলাম। ভারি মজা লাগে ওব বুলি শুনতে: অবিকল মানুষের গলার মত কথা—কে এলে? কে এলে?

প্রভা বাইরে থেকে বল্লে—কে ঘবের মধ্যে?

ও রান্নাঘরে রাঁধছিল। খুন্তি হাতে ছুটে এসেচে। খুন্তিতে ডাল লেগে রয়েচে। আমি হেসে বল্লাম—মাববে নাকি?

—ও! পাগলা ঠাকুর। তাই বলো। আমি বলি কে এলো দুপুরবেলা ঘরে।

—তোমার ঘরে কুলচুর নেই। কুসুম আমায় কুলচুর দিয়েচে। খুব ভালো কুলচুর।

—কুসুমের বড়নোক বাবু আছে। আমার তো তা নেই? কোথা থেকে কুলচুর আমচুর করবো।

—কুসুমের বাবু আমায় গজা দেবে।

—কেন দেবে না? মোড়ে অত বড় দোকানখানা কুসুমেব পায়ে

সঁপে দিয়ে বোসেচে। ওখানকার কথা ছেড়ে দ্যাও। বলে—মানিনী, তোর মানের বালাই নিয়ে মরি—

ভয়ে ভয়ে বল্লাম—প্রভা, রাগ কোরো না আমার ওপর।

—না না রাগ করবো কেন। দুঃখের কথা বলচি। আমিও এক-পুরুষ বেশ্যে। আমরা উড়ে আসিনি। পনেরো বছর বয়সে কপাল পুড়লে ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম।

—কেন ঘর থেকে বেরিয়েছিলে?

—সে সব দুঃখের কথা তোমার সঙ্গে বলে কি হবে। তুমি কি বুঝবে। বোসো, আমার ডাল পুড়ে গেল। গল্প করলে পেট ভরবে না।

—আমি যাই?

—এসো বান্নাঘরে।

প্রভার রং কালো, খুব মোটাসোটা, নাকের ওপর কালো ভোমরার মত একটা জড়ুল। প্রভা একদিন আমাকে গরম জিলিপি আর মুড়ি খেতে দিয়েছিল। ওর ঘরে এত জিনিষপত্তর নেই, ওই খাঁচায় পোষা টিয়া পাখিটা ছাড়া।

প্রভা রান্না করচে চালতের অম্বল। একটা পাথর বাটিতে চালতে ভেজানো। চালতে অনেকদিন খাইনি, দেশ থেকে এসে পর্য্যন্ত নয়। সেখানে আমাদের মাঠে তালপুকুরের ধারে বড় গাছে কত চালতে পেকে আছে এ সময়।

বল্লাম—চালতে পেলে কোথায় প্রভা?

—বাজারে, আবার কোথায়?

—বেশ চালতে।

প্রভা আর কিছু বল্লে না। নিজের মনে রাঁধতে লাগলো।

আমি বল্লাম—তোমার বাবা মা কোথায়?

—পাপমুখে সে সব কথা আর কি বলি।

—বাড়ি যাবে না?

—কোন্ বাড়ি?

—তোমাদের দেশের বাড়ি।

—যমের বাড়ি যাবো একেবারে।

—তোমাদের দেশের বাড়িতে কুল আছে? আমাদের গাঁয়ে কত কুলের গাছ।

প্রভা একথার কোন উত্তর দিলে না। আবার নিজের মনে রাঁধতে লাগলো। খানিক পরে সে একটা ঘটি উনুনের মুখে বসিয়ে চা তৈরি করে গ্লাসে আঁচল জড়িয়ে চুমুক দিয়ে চা খেতে লাগলো। আমায় একবার বল্লেও না আমি চা খাবো কি না। অবিশ্যি আমি চা খাইনে, চায়ের সর খাই। মা আমায় চা খেতে দেয় না। চায়ের মধ্যে যে দুধের সর ভাসে, মা তাই আমাকে তুলে দেয়।

প্রভা গল্প করতে লাগলো ওদের দেশের বাড়িতে কত গরু ছিল, কতখানি দুধ ওরা খেতো। ওদের বাড়ির ধারে ওদের নিজেদের পুকুরে কত মাছ ছিল। আর সে সব দেখতে পাবে না ও।

হঠাৎ প্রভা একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড করে বসলো। বল্লে—অম্বল দিয়ে দুটো ভাত খাবে।

আমি ভয়ে ভয়ে বল্লাম—খাবো। কুসুম টের না পায়।

প্রভা হেসে বল্লে—কুসুমের অত ভয় কিসের? টের পায় তো কি হবে? তুমি খাও বসে।

আমি সবে চালতের অম্বল দিয়ে ভাত মেখেছি, এমন সময় কুসুমের গলার শব্দ শোনা গেল—ও প্রভাদি, বামুনদের সেই খোকা তোর এখানে আছে? ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিই, কতক্ষণ এসেচে পরের ছেলে।

আমি এঁটো হাতে দৌড়ে উঠে রান্নাঘরের কোণে লুকিয়ে রইলাম। প্রভা কিছু বলবার আগে কুসুম ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে দেখতে পেলে। বল্লে—ওকি? কোণে দাঁড়িয়ে কেন? লুকানো হোল বুঝি? এ ভাত মেখেচে কে অম্বল দিয়ে? অ্যাঃ—

প্রভার দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—আচ্ছা প্রভাদি, ও না হয় ছেলেমানুষ পাগল। তোমারও কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গেল? কি ব'লে তুমি ওকে ভাত দিয়েচ খেতে?

প্রভা অপ্রতিভ হয়ে বল্লে—কেবল চালতে চালতে করছিল—তাই ভাবলাম অম্বল দিয়ে দুটো ভাত—

—না ছিঃ। চলো আমার সঙ্গে খোকা। এ জন্মের এই শাস্তি আমাদের, আবার তা বাড়াবো বামুনের ছেলেকে ভাত দিয়ে? চলো—হাত এঁটো নাকি? খেয়েচ বুঝি?

আমি সলজ্জস্বরে বল্লাম—না।

—চলো হাত ধুয়ে দিই—

কুসুম এসে আমার হাত ধরে বাইরের দিকে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করতে প্রভা বল্লে—আহা মুখের ভাত ক'টা খেতে দিলিনি ওকে। সবে অম্বল দিয়ে দুটো মেখেছিল—

—না, আর খেতে হবে না। চলো—

মায়ের শাসনের চেয়েও যেন কুসুমের শাসন বেশি হয়ে গেল। মুখের ভাত ফেলেই চলে আসতে হোল। উঠোনের এক পাশে নিয়ে গিয়ে আমায় হাত ধুয়ে দিতে দিতে বল্লে—তোমার অত খাই খাই বাই কেন খোকা? ওদের ঘরে ভাত খেতে নেই সে কথা মনে নেই তোমার? ছিঃ ছিঃ—ওবেলা কচুরি দেবো এখন খেতে। আর কক্‌খনো অমন খেও না। তাও বলি, এই না হয় ছেলেমানুষ—তুমি বুড়ো ধাড়ি,

তুমি কি বলে বামুনের ছেলের পাতে—ছিঃ ছিঃ লোকেরও বলিহারি যাই—

বলা বাহুল্য প্রভা এসব কথা শুনতে পায়নি, সে এদিকেও ছিল না।

বল্লাম—মাকে যেন বলে দিও না—

—হ্যাঁ আমি যাই তোমার মাকে বলতে! আমার তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—

—বল্লে মা মারবে কিন্তু।

—মার খাওয়াই ভালো তোমার। তোমার নোলা জব্দ হয় তাহোলে—

বাড়ি ফিরতেই মা বল্লেন—কোথায় ছিলি?

—ওই মোড়ে।

—আর কোথাও যাসনি তো?

—না।

একদিন কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। সেদিন দোষটা ছিল, কুসুমেরই। সে আমাকে বল্লে—চলো খোকা বেড়াতে যাই—যাবে?

বিকেলবেলা। রোদ বেশি নেই। ট্রাম লাইনের ওপারে যেতে দেখে আমি সভয়ে বল্লাম—মা বড় রাস্তা পার হতে দেয় না। বারণ করেচে।

—চলো আমি সঙ্গে আছি ভয় নেই।

বড় রাস্তা পার হয়ে আর কিছু দূরে একটা খোলার বস্তির মধ্যে আমরা ঢুকলাম। একটা সরু গলির দুধারে ঘরগুলো। যে বাড়িতে আমরা ঢুকলাম, সেখানেও সবাই মেয়েমানুষ, পুরুষ কেউ নেই। একজন মেয়ে বল্লে—আয় লো কুসুমি, কতকাল পরে—বাব্বাঃ, আমাদেরও কি আর নাগর নেই? তা বলে কি অমন করে ভুলে থাকতে হয় ভাই?

আমার দিকে চেয়ে বল্লে—এ খোকা আবার কে? বেশ সুন্দর দেখতে তো।

—বামুনদের ছেলে। আমাদের গলিতে থাকে। আমার বড্ড ন্যাওটো।

—বাঃ—বোসো খোকা, বোসো।

—ও ছেলের শুধু ভাই খাই খাই। খেতে ন্যাও খুব খুশি।

—তাই তো কি খেতে দিই। ঘরে কুলের আচার আছে, দেবো?

আমি অমনি কিছুমাত্র না ভেবেই, বলে উঠলাম—কুলের আচার বড্ড ভালবাসি।

কুসুম মুখ ঝামটা দিয়ে বল্লে—তুমি কি না ভালবাসো। খারাব জিনিস হোলেই হোল। না ভাই, ওর সর্দ্দি কাশি হয়েচে। ও ওসব খাবে না। থাক্।

আমার মনে ভয়ানক দুঃখ হোল। কুসুম খেতে দিলে না কুলচুর্। কখন হোল আমার সর্দ্দি কাশি? কুলচুর আমি কত ভালবাসি।

খানিকটা সে বাড়িতে বসবার পরে আমরা অন্য একটা ঘরে গেলাম। তারাও আমাকে দেখে নানা কথা জিগ্যেস করতে লাগলো। বাড়ির তৈরি সুজি খেতে দিলে একখানা রেকাবি করে। তাও কুসুম আমায় খেতে দিলে না। আমার নাকি পেটের অসুখ।

সন্ধের খানিকটা আগে আমাকে নিয়ে কুসুম বড় রাস্তার ট্রাম লাইন পার হয়ে এপারে এল। একখানা ট্রাম আসছিল। আমি বল্লাম—কুসুম, দাঁড়াও—ট্রাম দেখবো।

—সন্ধে হয়েচে। তোমার মা বকবে।

—বকুক।

—ইস্! ছেলের যে ভারি বিদ্ধি!

—আচ্ছা কুসুম তুমি ওকথা বল্লে কেন? আমায় কুলচুর খেতে দিলে না। ওরা তো দিচ্ছিল।

—তুমি ছেলেমানুষ কি বোঝো। কার মধ্যে কি খারাপ রোগ আছে ওসব পাড়ায়। তোমায় আমি যার তার হাতে খেতে দেবো? যার তার ঘরের জিনিস মুখে করলেই হোল, তোমার কি। কার মধ্যে কি রোগ আছে তুমি তা জানো?

—আচ্ছা কুসুম 'নাগর' মানে কি?

—কিছু না। কোথায় পেলে একথা?

—ওই যে ওরা তোমায় বলছিল।

—বলুক। ও সব কথায় তোমার দরকার কি? পাজি ছেলে কোথাকার।

কুসুম আমায় বাড়ির পথে এগিয়ে দেবার আগে বল্লে—চলো, কচুরি এতক্ষণ এনেচে ও। তোমায় দিই—

—দাও। আমার খিদে পেয়েচে—

—কোন্ সময়ে তোমার পেটে খিদে থাকে না বলতে পারো? তোমার মাকে যদি সাম্না সাম্নি পাই তো জিগ্যেস করি ছেলের অত নোলা কেন?

—নোলা আছে তো বেশ হয়েচে। কচুরি দেবে তো?

—চলো।

—গজা এনেচে?

—তা আমি জানিনে।

—গজা কাল দেবে?

—গলির রাস্তাটা কি নোংরা! বাবারে বাবাঃ!

—গঞ্জা দেবে তো ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ ! এখন কচুরি নিয়ে তো রেহাই দাও আমায়।

সে রাত্রে কুসুম আমায় আমাদের কলটার কাছে এগিয়ে দিয়ে চলে গেল। মার কাছে সত্যি কথা বল্লাম। কুসুমের বাড়ি গিয়ে ছিলাম। কুসুম কচুরি খেতে দিয়েচে। মা খুব বকলেন। কাল থেকে আমায় বেঁধে রাখবেন বল্লেন। বাবাকেও রাত্রে বলে দিলেন বটে তবে বাবা সে কথায় খুব যে বেশি কান দিলেন এমন মনে হোল না।

পরদিন সকালের দিকে আমার জ্বর হোল। চার পাঁচদিন একেবারে শয্যাগত। একজন বুড়ো ডাক্তার এসে দেখে শুনে ওষুধ দিয়ে গেল।

জানালার ধারেই আমাদের তক্তপোষ পাতা। একদিন বিকেলে দেখি রাস্তার ওপর কুসুম দাঁড়িয়ে আমাদের ঘরের উল্টো দিকের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। ওর সঙ্গে মাখম। মাখন এগিয়ে গিয়ে আরও দুখানা বাড়ির পরে একখানা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে।

আমি ডাকলাম—ও কুসুম—

কুসুম পেছন ফিরে আমায় দেখতে পেল। মাখমকে ডেকে বল্লে—দিদি, এই বাড়ি—এই যে—

মা কলতলায়। কুসুম ও মাখম এসে জানালার ধারে দাঁড়ালো।

কুসুম বল্লে—কি হয়েচে তোমার ? যাওনা কেন ?

মাখম বল্লে—কুসুমি ভেবে মরচে। বলে, বামুন খোকার কি হোল। আমি তাই বল্লাম, চল দেখে আসি।

বল্লাম—আমার জ্বর আজ পাঁচ দিন।

কুসুম বল্লে—তোমার মা কোথায় ?

—কুসুম তুমি চলে যাও। মা দেখলে পরে আমায় আর তোমাদের

ঘরে যেতে দেবে না। আমি সেরে উঠেই যাবো। চলে যাও তোমরা।

ওরা চলে গেল। কিন্তু পরদিন বিকেলে আবার কুসুম এসে রাস্তার ওপর দাঁড়ালো। নিচু সুরে বল্লে—যাবো?

মা ঘরে নেই। বদ্যিনাথদের ঘরে ডাল মেপে নিতে গিয়েচে আমি জানি। এই গেল একটু আগে। আমায় বলে গেল—ছোট খোকার দুধটা দেখিস্ তো যেন বেঁড়ালে খায় না, আমি বদ্যিনাথদের ঘর থেকে ডাল নিয়ে আসি—

হাত দেখিয়ে বল্লাম—এসো—

ও জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে বল্লে—কেমন আছ?

—ভালো। কাল ভাত খাবো।

—দুটো কমলানেবু এনেছিলাম। দেবো?

—দাও তাড়াতাড়ি।

—খেও।

—হ্যাঁ।

—অসুখ সারলে যেও—

—যাবো।

—কাল ভাত খাবে?

—বাবা বলেচে কাল ভাত খাবো।

—কাল আবার আসবো। কেমন তো?

—এসো। আমি না বল্লে জানালার কাছে এসো না।

—তাই করবো। আমি রাস্তায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবো। শিস্ দিতে পারো?

—উঁহু! আমি হাত দেখালে এসো।

পরের দুদিন কুসুম ঠিক আসতো বিকেলবেলা। একদিন প্রভা

দেখতে চেয়েছিল বলে ওকেও সঙ্গে করে এনেছিল। প্রভাও ছুটো কমলালেবু দিয়েছিল আমায়, মিথ্যে কথা বলবো না। বালিশের তলায় লেবু লুকিয়ে রেখে দিতাম, মা ঘরে না থাকলে খেয়ে ছিব্‌ড়ে ফেলে দিতাম রাস্তার ওপর ছুঁড়ে।

সেরে উঠে ছুদিন কুসুমের বাড়ি গিয়েছিলাম।

তারপরেই এক ব্যাপার ঘটলো। তাতে আমাদের কলকাতার বাসা উঠে গেল, আমরা আবার চলে এলাম আমাদের দেশের বাড়িতে। মা একদিন সোডাওয়াটার-এর বোতল খুলতে গিয়ে হাতে কাঁচ ফুটিয়ে ফেল্লে। সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। হাতের কব্জি থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগলো। বাসার সব লোক ছুটে এল বিভিন্ন ঘর থেকে। কোণের ঘরের বিপিনবাবু এসে মার হাতে কি একটা ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিলে। কিন্তু মায়ের হাত সারলো না। ক্রমে হাতের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠলো। মা আর রান্না করতে পারেন না, যন্ত্রণায় কাঁদেন রাত্রে। ডাক্তার এসে দেখতে লাগলো। আমার মামার বাড়ির অবস্থা ভাল। চিঠি পেয়ে মেজমামা এসে আমাদের সকলকে নিয়ে চলে গেলেন মামার বাড়িতে।

আষাঢ় মাসের শেষ। তাল ছুএকটা পাকতে সুরু হয়েচে। মামার বাড়ির গ্রামে মস্ত বড় একটা পুকুর আছে মাঠের ধারে, তার পাড়ে অনেক তালগাছ। আমি বেড়াতে গিয়ে প্রথম দিনই একটা পাকা তাল কুড়িয়ে পেলাম মনে আছে।

মার হাত সেরে গেল মামার বাড়ি এসে। ভাদ্রমাসের শেষে আমরা দেশের বাড়িতে চলে এলাম। কলকাতা আর যাওয়া হোল না। বাবাও সেখানকার বাসা উঠিয়ে দেশে চলে এলেন।

জ্যোতিরিঙ্গণ

সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর পরের কথা।

কলকাতায় মেসে থাকি, আফিসে কেরানীগিরি করি, দেশের বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র থাকে। আমার পুরোনো কলেজ-আমলের বন্ধু শ্রীপতির সঙ্গে বসে ছুটির দিনটা কি গল্প করতে করতে শ্রীপতি বল্লে—কাল ভাই সন্ধের পর প্রেমচাঁদ বড়ালের ষ্ট্রীট দিয়ে আসতে আসতে—দুধারে মুখে রং—হরিব্‌ল!

—আমিও দেখেছি। ঐ পথ দিয়েই তো আসি। আমি কিন্তু ওদের অন্য চোখে দেখি। ওদের আমি খুব চিনি। ওদের ঘরে এক সময়ে আমার যথেষ্ট যাতায়াত ছিল।

আমার বন্ধু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—তোমার!

—হ্যাঁ ভাই আমার। মাইরি বলচি।

—ঘাঃ, বিশ্বাস হয় না।

—আচ্ছা, চলো আমার সঙ্গে এক জায়গায়। প্রমাণ করে দেবো।

বছর পনের আগে একবার নন্দরাম সেনের গলি খুঁজে বার করে মাখমের বাড়ি যাই। কুসুম, প্রভা কেউ ছিল না। ওই দলের মধ্যে মাখমই একমাত্র সে খোলার বাড়িতে ছিল তখনো।

শ্রীপতিকে নিয়ে আমি চলে গেলাম নন্দরাম সেনের গলিতে। মাখম এখনো সেই বাড়িতেই আছে। একেবারে শনের নুড়ি চুল মাথায়, যক্‌থি বুড়ীর মত চেহারা। একটি দাঁত নেই মাড়িতে।

আমি যেতে মাখম বল্লে—এসো এসো। ভালো আছ?

—চিনতে পারো?

—ওমা, তোমায় আর চিনতে পারবো না? আমাদের চোখের সামনে মানুষ হোলে। ভালো কথা, কুসুমের খোঁজ পেইচি!

—কোথায়? কোথায়?

—শোভাবাজার ষ্ট্রীটে একটা মেস-বাড়ীতে ঝি-গিরি করে। ঢুকেই বাঁ হাতে। মন্দিরের পাশের ভাঙা দোতালা। আমায় সেদিন নিয়ে গিয়েছিল মন্দিরে নীল পূজো দিতে। তাই আমায় দেখালে।

শ্রীপতিকে নিয়ে সে মেস-বাড়ি খুঁজে বার করলাম। সন্ধে তখনো হয়নি, নিচে রান্নাঘরে ঠাকুরকে বল্লাম—তোমাদের ঝি কোথায় গেল?

—বাজারে গিয়েছে বাবু। এখুনি আসবে। কেন?

—দরকার আছে। তার নাম কুসুম তো?

—হ্যাঁ বাবু।

একটু পরে একজন লম্বা রোগা ঝি শ্রেণীর মেয়ে-মানুষ সদর দরজা দিয়ে ঢুকে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। ঠাকুর বল্লে—ও কুসুম, এই বাবুরা তোমায় খুঁজচেন।

আমি ঝিয়ের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। বাল্যদিনের সেই সুন্দরী কুসুম এই! মাখমের মত অত বুড়ী না হোলেও কুসুমও বুড়ী। বুড়ী ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যাবে না। ওর মুখ আমার মনে ছিল, সে মুখের সঙ্গে এ বৃদ্ধার মুখের কিছুই মিল নেই। ঠাকুর না বলে দিলে একে সেই কুসুম বলে চেনবার কিছু উপায় ছিল না।

কুসুমও আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বল্লে—আমায় খুঁজচেন আপনারা? কোত্থেকে আসচেন?

—মাখমের কাছ থেকে।

—কোন্ মাখম?

—নন্দরাম সেনের গলির মাখম বাড়িউলি।

—ও! তা আমায় খুঁজছেন কেন?

—চলো ওদিকে। কথা আছে।

—চলুন খাবার ঘরে।

খাবার ঘরে গিয়ে বল্লাম, কুসুম আমায় চিনতে পারো ?

—না বাবু।

—নন্দরাম সেনের গলিতে আমাদের বাসা ছিল। আমি তখন আট বছরের ছেলে। আমার বাবা মা ছিলেন ঈশ্বর নাপিতদের বাড়ির ভাড়াটে। মনে হয় ?

কুসুম হেসে বল্লে—মনে হয় বাবু। তুমি সেই পাগলা ঠাকুর! কত বড় হয়ে গিয়েচ। বাবা মা আছেন ?

—কেউ নেই।

—ছেলেপুলে ক'টি ?

—চার পাঁচটি।

—বোসো বোসো বাবা।

আরও অনেক কথাবার্ত্তার পরে কুসুম আমাদের বসিয়ে বাইরে কোথায় চলে গেল। খানিক পরে চট্ করে কোথা থেকে একটা শালপাতার ঠোঙায় খাবার এনে দুখানা থালাতে আমাদের দুজনকে খেতে দিলে।

আমারও মনে ছিল না। খেতে গিয়ে মনে হোল। বড় বড় হিংয়ের কচুরি চারখানা। তখুনি মনে পড়ে গেল কুসুমের সেই বাবুর কথা, সেই হিংয়ের কচুরির কথা। মনে এল ত্রিশ বছর পরে আবার সেই লোভী ছেলেটির ছবি ও তার কচুরিপ্রীতি। কুসুমের নিশ্চয় মনে ছিল। কিংবা ছিল না—তা জানিনে। কচুরি খেতে খেতে আমার মন সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ধূসর ব্যবধানের ওপারে আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেচে একেবারে নন্দরাম সেনের গলির সেই অধুনালুপ্ত গুড়ের আড়তটা ও রাস্তার কলটার সামনে, যেখানে কুসুম আজও পঁচিশ বছরের যুবতী, যেখানে তার বাবু আজও সন্ধেবেলায় ঠোঙা হাতে হিংয়ের কচুরি নিয়ে আসে নিয়মমত।